

কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’: সাহিত্যরস

সুমিতা টুডু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/15_Sumita-Tudu.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্যধারার মধ্যে একটি হলো ভ্রমণসাহিত্য। ভ্রমণসাহিত্য কী এবং কেন ভ্রমণসাহিত্য — তা আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ একটি ভ্রমণকাহিনি, বলাবাহুল্য বাঙালি মহিলা লিখিত প্রথম ভ্রমণকাহিনি। অন্যদিকে এটি কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রথম রচনা অর্থাৎ এই রচনার মাধ্যমেই কৃষ্ণভাবিনীর সাহিত্য প্রাঙ্গণে পদার্পণ। অনেক সময় দেখা যায় খ্যাতনামা লেখকের মধ্যেও প্রথম দিকের রচনার সঙ্গে শেষ জীবনের রচনার বিস্তর ফারাক, তা যেমন বিষয়ের দিক থেকে তেমনি মানসিকতার দিক থেকেও। তবে কৃষ্ণভাবিনীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাঁর প্রথম রচনার ছাপ পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করি। তবে তা এখানের আলোচ্য বিষয় নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’য় সাহিত্যরস কতখানি তার পর্যালোচনা।

সূচক শব্দ: সাহিত্যরস, ব্যারিস্টারি, অনুবর্তিনী, হিমালীপুঞ্জ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, যুগ্মোদ্যতা।

কৃষ্ণভাবিনী দাস ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুরের কাজলাগ্রামে (অন্যমতে চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া) জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিত পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ার দরুণ তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশেই তাঁর হাতেখড়ি হয়। রাজকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতোই তিনিও প্রকৃত অর্থে শিক্ষার সুযোগ পান বিবাহের পর। দশ বছর বয়সে শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন কৃষ্ণভাবিনী। স্বামীর উৎসাহে কৃষ্ণভাবিনীর শিক্ষাজীবনের শুরু, তবে স্কুল বা কলেজের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি পাননি। ঘরই ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র এবং দেবেন্দ্রনাথই তাঁর প্রধান শিক্ষক। স্বশুরমশাই শ্রীনাথ দাস ছিলেন হাইকোর্টের উকিল এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব শ্রীনাথকে তত্ত্বগতভাবে প্রচলিত সংস্কারের ধারায় অনুপ্রাণিত করলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই দেবেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়ে বিলেত থেকে ফিরলে তাঁকে গৃহচ্যুত করেন শ্রীনাথ। এমনকি পাঁচবছরের কন্যাকে ছেড়ে স্বামীর অনুবর্তিনী হতে বাধ্য হন কৃষ্ণভাবিনী। সেই সুবাদেই ইংল্যান্ড যাত্রা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ১৮৮৫তে প্রকাশিত ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’য়। ১৮৯০ সালে দেশে ফিরে নারীসেবা মূলক কাজে যুক্ত থাকার সময় অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ‘ভারতী ও বালক’, ‘সাহিত্য’, ‘বামাবোধিনী’, ‘ধুব’, ‘মহিলা’ প্রভৃতি পত্রিকাতে। প্রবন্ধগুলি সবই নারী এবং সমাজ সংস্কার মূলক। যথা — ‘শিক্ষিতা নারী’, ‘স্ত্রীলোক ও পুরুষ’, ‘জগতে নারী’, ‘সমাজ ও সমাজ সংস্কার’ আরো অন্যান্য। ‘জীবনের দৃশ্যমালা’(১৯০৬) নামে একটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন কৃষ্ণভাবিনী। ১৯০৯ সালে পর পর স্বামী-কন্যাকে হারানোর পর তাঁর জীবন সঁপে ছিলেন জনসেবায়, স্ত্রীশিক্ষা বিতরণে, বিধবশ্রম ও পতিতশ্রম নির্মাণে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রয়াণ ঘটে।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক, কৃষ্ণভাবিনীর রচনাটি কতটা সাহিত্য-গুণাঙ্কিত! এমন সংশয়ের কারণ, সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি এই ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ রচনাটির মাধ্যমে। আর একটি অন্যতম কারণ সমকালীন সমাজ। সেই সময়ে নারী শিক্ষা সমাজে অল্পবিস্তর প্রচলন থাকলেও বিলেতে পাড়ি দেওয়া সহজ ভাবে মেনে নিত না সমাজ। কৃষ্ণভাবিনী দাসের পূর্বেও কয়েকজন বাঙালি নারী বিলেতে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন তবে, নারী হিসাবে পাঠক সমাজের কাছে বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কৃষ্ণভাবিনীই প্রথম। সে সম্বন্ধে

সমালোচক সুদক্ষিণা ঘোষের মন্তব্য — “...কল্পভাবিনী দাস, ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’র যাপনকাহিনি তো তাঁরই কলমে প্রথম পড়েছি আমরা।”^২

রচনাটিতে মূলত কল্পভাবিনী দাসের প্রথম ঘোমটা খুলে বাইরে বেরনো, কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড যাত্রাপথের বর্ণনা এবং লন্ডনে পৌঁছে সেখানকার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা আছে। তাঁর কাছে ‘বিদেশ ভ্রমণ’ ও ‘স্বাধীনতা’ যেন এক হয়ে উঠেছে, সেকথা ভ্রমণকাহিনিটি পড়লেই অনুভব করা যায়। কল্পভাবিনীর বয়ানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে — “কীর্তিদাস পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইয়া যায়, আমি নিজেও দেখিতেছি যে, যতদিন হইতে ইংলণ্ডের বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে।”^৩

‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ রচনাটির তৃতীয় অধ্যায় ‘বোম্বাই হইতে বেনিস’ অংশে কল্পভাবিনী যখন বোম্বাই-এ জাহাজে উঠেছেন, সেখান থেকে বোম্বাই নগর দেখে বলছেন — “আমরা এখনও বোম্বাই উপসাগরের মধ্যে, তিনদিকে নগর ও উঁচু উঁচু বাড়ী; যেন মুনীরা শ্বেতবস্ত্র পরিয়া সমুদ্রের ধারে ধ্যান করিতেছে আর সমুদ্রের ঢেউ গিয়ে তাঁহাদের চরণ ধুইয়া দিয়া আসিতেছে; এক একবার নাচিয়া যেন বিরক্ত করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রাহ্য নাই, অটল ধ্যানে মগ্ন।”^৪

সমুদ্র ধারের সাদা সাদা বাড়ি দেখে সেগুলিকে ধ্যানমগ্ন মুনীর সঙ্গে তুলনা করছেন কল্পভাবিনী। পাকাপোস্ত লেখকের মতোই কলম চালিয়েছেন তিনি। আবার যখন রাতের আকাশে তারা ফুটেছে তাঁর মনে হয়েছে — “নগরও যেন তারার মালা পরিয়াছে;”^৫ এই অধ্যায়েই সূর্যাস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন — “যেমন কোন সাধুলোকের মৃত্যুর পর তাঁহার যশ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া থাকে, সেই রূপ অস্ত্র যাইবার পরেও সূর্য্যের আভা তাহার তেজের পরিচয় দিতে লাগিল।”^৬

চতুর্থ অধ্যায় ‘বেনিস হইতে লন্ডন’এ আঙ্গলস পর্বতের পাদদেশ হয়ে যাত্রা করার সময় আঙ্গলস পর্বতের চূড়াতে জন্মে থাকা বরফে সূর্য্যকিরণ পড়ে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য তৈরি হয়েছে। লেখিকা সেই দৃশ্য দেখে আশ্লুত হয়ে জানাচ্ছেন — “উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গাগুলি ধবলবর্ণ তুষারে আবৃত, তাহার উপর অরুণ-কিরণ পতিত হওয়াতে হিমালীপুঞ্জ অতিশয় ঝক্ ঝক্ করিতেছে; দূর হইতে মনে হয় যেন পর্বতরাজ হীরার মুকুট পরিয়া বসিয়া আছেন।”^৭ চোখের দেখা আর দেখার চোখ যে ভিন্ন, সেকথায় উদ্ভৃতাংশটি থেকে প্রমাণিত হয়। সকলের দৃষ্টিতে যা সাধারণ, সাহিত্যিকের কলমে তার অসাধারণত্ব ফুটে ওঠে। এভাবেই কল্পভাবিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অতি সামান্য বিষয়কেও দেখছেন এবং ফুটিয়ে তুলেছেন অনন্যসুলভ প্রতিভার মাধ্যমে।

কল্পভাবিনী লন্ডনে বসবাসকালীন বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন নতুন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মনুষ্য-প্রকৃতি সম্পর্কেও আলোকপাত করছেন। তাঁর মতে নতুন বিষয়, স্থানের সম্পর্কে জেনে যতটা আনন্দ ও উপকার হয়, তার চেয়ে অধিক আনন্দ ও উপকার হয় মনুষ্য-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে। তিনি রচনাটির সপ্তম অধ্যায় ‘ইংরেজ জাতি ও তাহাদের প্রকৃতি’ অংশে ইংল্যান্ডের নারীদের ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতবেগে যেতে দেখে তাঁদের যুদ্ধোদ্ভাতা চামুড়া এবং ইংল্যান্ডের বালক-বালিকাদের ঈষৎ রক্তিম কিশোর মুখ দেখে ‘নব প্রস্ফুটিত গোলাপ’ এর সঙ্গে তুলনা করছেন। দ্বিতীয়, দশম এবং বিংশ অধ্যায়ে তাঁর তিনটি কবিতাও দেখতে পায়। বলতে পারি কবির কলমের ছোঁয়া পেয়ে রচনাটি অন্যমাত্রা লাভ করেছে।

চতুর্দশ অধ্যায় ‘ইংল্যান্ডের অন্তর্ভাগ — চাষা ও জমীদার — এদেশের জলবায়ু’তে বৃষ্টির পরে মাঠের শোভা যে বেড়ে যায়, তার ছবি দেখি কল্পভাবিনীর কলমে — “মাঠের ঘাস নবীন ও সজীব হইয়া উঠে, ছোট ছোট বৃক্ষ পত্র হইতে পতনোন্মুখ জলবিন্দুগুলি মুক্তরাজির ন্যায় ঝকিতে থাকে, নবোদিত সূর্য্যকিরণে আচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত মাঠ আরো উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং শুল্ক ও পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের ফুলগুলিতে সূর্য্যকিরণ

প্রতিফলিত হইয়া উহাদের মনোহারিতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করে।”^৮ এই অধ্যায়েই লৌহকারখানার অন্দরের তাপ, ধোঁয়া এবং বিকট গর্জন কৃষ্ণভাবিনী চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন — “শত শত ধূমনরাজি-বিনির্গত অগ্নিদ্যুতি তামসী নিশা ভেদিয়া লোহিত ময়ূরপুচ্ছের শোভা বিস্তার করিতেছে; স্তূপাকার জ্বলন্ত লৌহপাথরের নিপ্রভ দ্যুতি নিরখিয়া ভ্রম হয় যেন পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ মহাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে;”^৯

যে কোনো সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সাহিত্যরস। ভ্রমণ সাহিত্যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যরসও অন্যতম একটি উপাদান। সাহিত্যরসই ভ্রমণকথাকে ভ্রমণসাহিত্যে পরিণত করে। ভ্রমণসাহিত্যের দুটি মূল বিষয় — ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্যরস। কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ রচনাটিতে অধ্যায় বিভাজন ও অধ্যায়ের শিরোনাম দেখেই বোঝা যায়, ভ্রমণের গতিপথ ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কতখানি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণভাবিনী। দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যরসের প্রভাব নিয়ে উদ্ভূতি-সহ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো। রচনাটিতে রাতের আকাশের তারা কিংবা উঁচু পর্বত শৃঙ্গের সাদা বরফে পড়া সূর্যকিরণ হীরের মুকুট রূপে ধরা দিয়েছে, এ যেন রচনাটিতে যথার্থ সাহিত্যরসকেই ব্যক্ত করে। পরবর্তীতে বাংলা ভ্রমণসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে নব উচ্ছ্বাসে যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ প্রথম দিকের ভ্রমণকাহিনি হয়েও যথেষ্ট সাহিত্যরসের প্রভাব লক্ষ্য করি, এখানেই কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’ যথার্থ ভ্রমণসাহিত্য হিসাবে দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘ভূমিকা’, সীমন্তী সেন, আকর ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্ত্রী প্রকাশনী, ১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৬, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ২৭-৩১
২. ‘মুক্তিপথের দিশা: ‘বঙ্গমহিলা’দের ভ্রমণবৃত্তান্ত’, সুদক্ষিণা ঘোষ, ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য, কোরক, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২৭৭
৩. ‘ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা’, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্ত্রী প্রকাশনী, ১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৬, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১২৯
৪. ওই, পৃ. ১৭
৫. ওই
৬. ওই, পৃ. ২০
৭. ওই, পৃ. ৩১-৩২
৮. ওই, পৃ. ১০৫
৯. ওই, পৃ. ১১১

লেখক পরিচিতি: সুমিতা টুডু, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।